২।

এই সংখ্যায় ভেতরের পাতায়
√ গলাব্যথা ও তার চিকিৎসা
√ আর্সেনিক বিষক্রিয়া এবং কৃষির মাধ্যমে তার প্রতিকার
√ পামতেল কি ওরাং-ওটাং-এর বিলুপ্তি ঘটাবে

বিজ্ঞান অন্বেষক

ADMISSION GOING ON
ALBATROSS SCHOOL
(Near- Kanchrapara College)
Contact No. 25855868, 9339425472
Bengali Medium : Nursery to IV
English Medium : Nursery to VI
Office Hour : 10.00 am–12.30pm

বর্ষ -৩ | তৃতীয় সংখ্যা | মে-জুন /২০০৬ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

ময়ূর

পক্ষী শ্রেণীর প্রাণী, বৈজ্ঞানিক নাম প্যাভো ক্রিস্টেসাস (Pavo Cristesus)। দেহের সামগ্রিক সৌন্দর্যের জন্য ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে তিনটি প্রজাতির ময়ূর রয়েছে।

রঙিন ময়ূর ছাড়া শ্বেতময়ূরও বিখ্যাত। ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলে এদের কিছু কিছু দেখা যায়। ময়ূরের গ্রীবা দীর্ঘ এবং দেহ যথেষ্ট বড় আয়তনের। চক্ষু তীক্ষ্ন এবং গোলাকার। ময়ূরের পুচ্ছকে পেখম

এরপর ৪ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

বান কাটানো

হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে মগড়া স্টেশনের পূর্ব দিকের রাস্তা ১ মিনিট হাঁটলেই অগ্রগামী সংঘ ক্লাব। ওই ক্লাবের পাশ দিয়ে ডান দিকের রাস্তা পূর্ব শেখপাড়া গ্রাম। এই অগ্রগামী সংঘ বড় রাস্তাতে হলেও তাদের পূজা মণ্ডপ কিন্তু এই পূর্ব শেখ পাড়াতেই। এই পূজা মণ্ডপের ডান দিকেই সরু মাটির রাস্তা বাঁ দিক, ডান দিক করে এক জলহারা পুকুরের পাশ দিয়ে, বাঁশ ঝাড় পেরিয়ে এক বাড়ির উঠানে শেষ হয়েছে। সামনেই পাকা নতুন পাকা দোতলা বাড়ি। ডান দিকে দু

এরপর ৬ পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা

১৯৭২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক মানব পরিবেশ শীর্ষক স্টকহোম্ কনভেনশন থেকে ৫ জুন দিনটি আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষিত। ১৯৭২, '৮২, '৯২ ও ২০০২ মোট ৪ বার আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভারত সহ পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশেরই কর্তাব্যক্তিরা ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতিটি সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী ঘোষিত হয়। পরিবেশ সমস্যার সমাধান তথা হ্রাসের জন্য নানান কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ঘোষিত হয়ে আসছে। অথচ আমরা বাস্তবে দেখছি পরিবেশ সমস্যাগুলি আরও বেড়ে চলেছে এবং তাতে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। পরিবেশ সমস্যা ও দূষণের বেশ কয়েকটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পরিবেশ সমস্যাগুলির বিবরণ রাখা হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : চিত্র : (১)

"নদীয়ায় নদীর দূষণে মাছে মড়ক' — নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাথাভাঙ্গা নদীতে মাছের মড়ক লাগায় মাঝদিয়া গ্রামের অধিবাসীরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অধিকর্তার কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গণস্বাক্ষর সম্বলিত দাবি পেশ করেছেন। স্থানীয় BLLRO (ব্লকভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক) জানিয়েছেন যে নদী দূষণ প্রতিরোধে তার দপ্তরের কিছুই করার নেই। মাথাভাঙ্গা নদী সহ চুর্ণী ও ইচ্ছামতী নদীর জলও দূষিত বলে মৎসজীবীরা অভিযোগ করেছেন। শুধু মাছই মরছে না, নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের জলবাহিত রোগ ও চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। কয়েক হাজার মানুষ এই নদী দূষণের শিকার হয়ে পড়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ফসফেট জাতীয় কীটনাশক (Organophosphate Pesticide) 'সুমিডন-৪০' ধানের জমিতে ব্যবহারের ফলে জলদূষিত হয়ে পড়ছে। এই কীটনাশকটি মাছের প্রজননের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া অন্যান্য মাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপঅধিকর্তা, মৎস বিভাগের (রোগজনকজীবাণু ও পরজীবি বা Microbiology & Parasitology) একদল গবেষক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩৯ রকম আঞ্চলিক মাছের প্রজাতি হারিয়ে যাচ্ছে। সারা ভারতে ৮৮ ধরনের মাছ শুধুমাত্র ওয়েস্টার্ন ঘাট ও ৮২ ধরনের মাছের প্রজাতি পূর্ব হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে কীটনাশক চাষের জমিতে ব্যবহারের জন্যই এই অবস্থা হয়েছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কৃত্রিম ভাবে

এর পর ২ পাতায়

নীলকণ্ঠ গাছের খোঁজে

গাছ মাত্রই দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের মত, কেননা আমরা তো এখন সবাই জানি আমাদের চারপাশের ছড়ানো পৃথিবীর কার্বন-ডাই অক্সাইড এর মতো বিষ একমাত্র সবুজ উদ্ভিদরাই গিলে নিতে পারে দিব্যি সহজে এবং তার বদলে বাতাসে ফিরিয়ে দিতে পারে এবং দেয় প্রিয় অক্সিজেন। সব সবুজ গাছই যদি এরকম 'জেনে শুনে বিষ' পান করে নীলকণ্ঠ, তবে আর কেন নতুন করে অন্য কোন নীলকণ্ঠ গাছের খোঁজ? প্রশ্ন একটা থেকেই যায়।

বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়াও আছে, এই পৃথিবীতে আরো অন্যতর বিষ এবং তা ভয়াবহতার দিক থেকে মৃত্যুর সমান। যে জলের অপর নাম জীবন, সেই জলের হাত ধরেই তার এই জীবনবিরুদ্ধ আঘাত। হ্যাঁ, আর্সেনিকের কথাই বলছিলাম। আর্সেনিক আর আতঙ্ক যেন সমার্থক বিশেষত : আমাদের এই বাংলায়। কেবল পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার নয় বাংলাদেশও এর মারণ কালো হাত থেকে দূরে নয়। অবশ্যি বিশ্বের আরো অন্যান্য দেশও কমবেশী 'আর্সেনিকোসিস'র শিকার। বলাই বাহুল্য ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের মাধ্যমে এই বিষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এর প্রভাবে বাধ্যতামূলকভাবে ঘটে যেতে পারে অঙ্গহানি তথা মৃত্যু পর্যন্ত। আর সেই মৃত্যু তিল তিল কষ্ট ও যন্ত্রণার। কেননা তার আগে আক্রান্ত মানুষ প্রবল মানসিক ব্যাধিতেও ভুগতেও পারেন।

মানুষের শরীরে যে সমস্ত মৌলগুলি কাজে লাগে তার মধ্যে

এর পর ৩ পাতায়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

১ পাতার পর

আবেশের সাহায্যে প্রজনন ঘটিয়ে (Induced breeding) মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিবেশ দূষণ : চিত্র : ২

কোচবিহারের কারখানার বর্জ্যে দূষণ, নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ছে। তিস্তা, কালজানি, আত্রেয়ী, তোর্সা নদীর ভাঙ্গনে বিপন্ন বহু গ্রাম।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শহর কোচবিহার থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে নর্থ বেঙ্গল স্ট্র বোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে নির্গত নোংরা এলাকার জলে মিশে বহু এলাকা অনাবাদি করে দিচ্ছে। দূষণে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ জানালে মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষিত জল পাইপের মাধ্যমে তোর্সা নদীতে ফেলবার পরিকল্পনা করেন। তোর্সা নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ছে এবং উগ্র গন্ধে পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ও স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা (ঘুঘুমারী হাইস্কুল) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসে রেজেস্ট্রি ডাকে অভিযোগ দায়ের করার ১০ বছর পরেও কোন সুরাহা হয়নি। যদিও পঞ্চায়েত সমিতি ও অন্যান্য সরকারী কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট বসানো দরকার। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোন ভূমিকাই নেই, তাছাড়া কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্ষদের অফিসের দূরত্বও অনেক। কোনরকম আইনি ব্যবস্থা বা শুনানী কিছুই হয়নি। দূষণ বেড়েই চলেছে।

কালজানি, তোর্সা, আত্রেয়ী সহ বহু নদীর ভাঙ্গনে হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলীর বলাগড়, নদীয়ার চাকদহ, জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার সহ বহু এলাকা।

নদী ভাঙ্গন আসলে প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ সমস্যা। দ্রুত বাঁধ সংস্কার করা, নদীর পাড়ে বড়বড় গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।

জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহরের উপর দিয়ে তিস্তা নদী বয়ে চলেছে, ডিমা নদী, জয়ন্তী, বালা নদীর গভীরতা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্ষাকালে নদীর জল জনপদের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। বিশেষত জলবাহিত রোগে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। ২০০৪ সালের জুন মাসে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় শুধুমাত্র (৬-৬-০৪) ডুয়ার্সের মাদারহাট অঞ্চলের হান্টাপাড়া চা বাগানে অপরিস্রুত জল পান করেই ৭ জন মারা যান। এছাড়া বেশ কয়েকশো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ২০০০ সালে এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০২ সালে আলাদাভাবে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সমীক্ষকদের মতে (১) তিস্তা নদী জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১.৪ থেকে ১.৫ মিটার উঁচু দিয়ে বইছে।

(২) নদীবক্ষ উঁচু হওয়ায় আগামী দিনে ভারী বৃষ্টি হলে বন্যা পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

(৩) জঙ্গল কমে যাওয়ায় পাহাড়ের মাটি পূর্বের মতো জল ধরে রাখতে পারছে না। বৃষ্টির সময় মাটি, পাথর ধ্বসে নদীতে নামছে। মাটির ক্ষয় বাড়ছে।

বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে জানা যায় উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি নদীরই ভাঙ্গন সমস্যা বাড়ছে, নাব্যতা কমছে। বিভিন্ন সংরক্ষিত জঙ্গলে জলাশয়ের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে জলধারণের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণীরা বহুক্ষেত্রেই পারিবেশিক ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ফলে বহু বন্য প্রাণী মারা যাচ্ছে, আবার লোকালয়ে ঢুকে বহু মানুষকেও বন্যপ্রাণীরা মেরে ফেলছে। বনদপ্তরের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় জলদাপাড়া, গরুমারা চামড়ামারী, চিলাপাতা বক্সারিজার্ভ ফরেস্ট (BTR) এ খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ব্যহত হওয়ায় হাতী, বাইসন ও চিতা বাঘ লোকালয়ে চলে আসছে।

নদীগুলির নাব্যতা কমে যাওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞরা নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী করেছেন — (১) পাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গলে নির্বিচারে ধ্বংস, (২) জনবসতির সম্প্রসারণ, (৩) অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ, (৪) জলাভূমি ভরাট করে জনবসতি তৈরী। জঙ্গলে কমে যাওয়ায় পাহাড়ের মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

পরিবেশে জঙ্গলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, জলাভূমি সংরক্ষণ ও পাশাপাশি খাদ্য-খাদ্যকের ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই জরুরী।

পরিবেশ দূষণ চিত্র : ৩

শিল্প-কারখানার দূষণ বাড়ছে, অতিষ্ঠ শহরাঞ্চল ও গ্রামবাংলা, প:ব: দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ।

(ক) উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরের বাতাসে বিপজ্জনক মাত্রায় ধুলিকণার পরিমাণ বাড়ছে, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ সহ অন্যান্য রোগ বাড়ছে। পরিবেশ দপ্তর সমীক্ষা করে জানিয়েছে ২০০২ সালে বাতাসে ধুলিকণার পরিমাণ ছিল ১৫৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে, ২০০৫ সালের সমীক্ষায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৬ মাইক্রোগ্রাম, সালফার ডাই অক্সাইডের (SO_2) পরিমাণ ৬ মাইক্রোগ্রাম থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ মাইক্রোগ্রাম। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা যায় শিলিগুড়িতে দূষণ রোধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

(খ) ছোট ও মাঝারি মাপের শিল্প কারখানাগুলির দূষণের মাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। (যেমন হাস্কিং মেশিন, স্টীল তৈরীর কারখানা (ফার্নিচার), চামড়ার কারখানা প্রভৃতি)। নিয়মানুযায়ী দূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অভিযোগপত্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাধ্যমে শুনানী চলে, পরে সিদ্ধান্ত জানানো হয়। দূষণকারী শিল্পের মালিককে সাজা দেওয়ার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় যার নাম 'কমিটি ফর দি ক্লোজার'। এই কমিটিতে মোট চারজন সদস্য থাকবে, যার তিনজনই হবে শিল্প-কারখনার (দূষণকারী) প্রতিনিধি, একমাত্র প্রতিনিধি হবেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রতিনিধি বা সদস্য সচিব। ফলে দূষণকারী শিল্পের মালিকদের বিরুদ্ধে আদৌ কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। বিশেষত দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের 'ল' (আইন) বিভাগ পুরোপুরি ঠুঁটো জগন্নাথ। পর্ষদ সূত্রে জানা যায় প্রায় কয়েকশো অভিযোগপত্র জমা পড়ে আছে, আগে যাও বা শুনানী হতো, ইদানিং তাও আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অক্ষম। পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী জানান শিল্প দূষণের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শিল্পপতিদের উপরেই ন্যস্ত হওয়ার জন্য আইন প্রয়োগ করার প্রস্তুতি চলছে। দূষণ ছাড়পত্র পেতে আর কোন অসুবিধাই হবে না, পাশাপাশি গণশুনানীরও আর কোন প্রয়োজন থাকবে না।

এরপর ৮ পাতায়

নীলকণ্ঠ গাছ

১ পাতার পর

দ্বাদশতম স্থানে আছে আর্সেনিক। রাসায়নিক সংকেত যার 'As' কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, (আগে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতা ছিল ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার জলে) আর এই পরিমাণটাই এখন বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যা অদূর ভবিষ্যতে মহামারির আকার ধারণ করতে পারে। 'অদূর' বলছি কেন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ জলের আর্সেনিক দুষ্টির শিকার সেখানে ইতিমধ্যেই 'উপদ্রুত' বলাই যেতে পারে। উপরন্তু বেসরকারি সমীক্ষায় জানা গেছে প্রতিদিন প্রায় দু কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী আর্সেনিকযুক্ত জলপানে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলাদেশে, দুই-তৃতীয়াংশ এলাকার নলকূপের জলে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিক ধরা পড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা 'আর্সেনিকোসিস' এর এখনো পর্যন্ত তেমন কোন ওষুধ বেরয়নি যা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় ৯টি জেলার ৭৯টি ব্লকে আর্সেনিক আক্রান্ত। এই জেলাগুলি হল নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও কলকাতা। এই জেলাগুলির ১২০৬টির বেশি গ্রাম এখন আর্সেনিক আক্রান্ত বা বড় অর্থে 'আহত' বলা যায়। প্রায় আড়াই লক্ষ আদম সন্তান আর্সেনিক জনিত চর্মরোগের শিকার। করতলের আয়ুরেখা কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে আর্সেনিক। শিরোরেখায় আর্সেনিকজনিত অভিশপ্ত লাল লাল দাগ। তথাকথিত রবি রেখা মুছে গেছে বরং সেখানে ফুটে উঠেছে আরক্ত ফুসকুড়ি। ফলত: চামড়ার ক্যানসারও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই আর্সেনিকের দুষ্টু দৃষ্টিতে। বেড়ে চলেছে যৌনাঙ্গের ক্যানসারও। একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক একবার। ১৯৮৪তে এই রাজ্যে আর্সেনিক জনিত চামড়ার ক্যানসার ও কোষ ক্যানসারের রোগী ছিলো ২ জন। ৯১'এ তা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৭১ ও ৫৬ জন। ৯৮' সালে যা যথাক্রমে ২১২ এবং ১৬১ জন। এখন কথা হচ্ছে আমাদের গাঙ্গেয় অববাহিকায় আর্সেনিকের দূষণ এতো বেড়ে যাচ্ছে কেন? কারণ হিসেবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের ধারণা এইসব এলাকার ভূস্বকে আর্সেনিক ঘটিত আকরিকের উপস্থিতি। এই আকরিকের জারণ বা অক্সিডেশান এর ফলে উদ্ভূত যৌগ (স্কোরডাইট) জলে দ্রাব্য। আর্সেনিক ভূ-বলয়ে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল যত তুলে নেওয়া যায়, জলের তল ততই নিম্নমুখী হয়। ফলত: জলতলের উপরাংশের বাতাসের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এই বায়ুর অক্সিজেন আরো বেশি অদ্রাব্য আর্সেনিকযুক্ত আকরিককে জারিত করে জলে দ্রাব্য আর্সেনিক যৌগে পরিণত করে। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার যত বাড়বে (বলাবাহুল্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিরিখে এটি অনিবার্য) জলে আর্সেনিক দূষণও কেন্দ্র ও পরিধির দিকে ততই বেড়ে যাবে। আমরা জানি যে, বোরো ধান চাষের জন্য বেশি পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার হয়ে থাকে। যার ফলে আর্সেনিকযুক্ত শিলাস্তর ক্রমশই উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে সেটাই হয়ে ওঠে আর্সেনিক দূষণের মূল কারণ। কেবল পানীয় জল নয়, সেচের জল থেকে ধান বা ফসলের মধ্যেও এই দূষণ চারিয়ে যায়। 'স্লো' পয়জনে'র মতন গভীর গোপন। অসুস্থতার এই উর্ধ্বমুখী লেখচিত্রই কি নিঃশব্দে জানান দিচ্ছে না 'মানুষ বড় কাঁদছে, মানুষের পাশে দাঁড়াও' (?)

পাশে দাঁড়ানোর এই মহতী প্রেক্ষীতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারুইপুর, চাকদা, দেগঙ্গা এবং আরো অন্যান্য প্রত্যন্ত গ্রামে বেশ কিছু আর্সেনিকবিহীন পানীয় জলের প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি ছিল 'মাত্রই'। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা এই বিষ যদি না প্রাকৃতিকভাবেই অতিক্রম না করা যায় তাহলে যা কিছু হবে তা হবে সাময়িক সমাধান। স্থায়ী কিছু নয়। একটা সহজ উপমা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে। ধরা যাক, পেস্টিসাইডের ব্যবহারে ক্ষতিকারক পোকামাকড় যেমন দমন করা যায়, ফলন যেমন বাড়ে, সেই সূত্রে ফসলের ভিতর দিয়েও পেস্টিসাইডের বিষ অল্প পরিমাণে হলেও চলে যায় মানব শরীরে খাদ্যের অনুষঙ্গী হয়ে। ফলে পরোক্ষভাবে মানুষেরও ক্ষতি হয়ে যায় এবং তা সুদূরপ্রসারী। কিন্তু তাতো প্রার্থিত হতে পারে না। তাই বিকল্প হিসেবে আজ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতন ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়ে উঠেছে। ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতান্ত্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের পদ্ধতি মেনে খাদ্য খাদকের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে ক্ষতিকারক জীবের জন্যে অন্য কোন জীবের ব্যবহার যথেষ্ট সফলতা দান করেছে। বিশেষত প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায়। অথচ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ছাড়াই এটা সম্ভব। এ যেন একধরনের অস্ত্রোপোচারহীন অপারেশন। বলা বাহুল্য সাময়িক নয়। এই সাময়িকতার বিরুদ্ধে ভাবতে ভাবতেই বিশ্বজুড়ে আর্সেনিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হতেই, অবশেষে প্রকৃতিই আবার বাড়িয়ে দিয়েছে তার আশীর্বাদী হাত।

না 'ভগবানের হাত' নয়, অলৌকিক নয়, আরো প্রসারিত অর্থে প্রকৃতির হাত। প্রকৃতির ভেতরেই পাওয়া গেছে তার সন্ধান। সে একটি সামান্য জলজ ফার্ন— আর্সেনিক দূষণ রোধে অসামান্য যার ভূমিকা — উদ্ভিদ রাজ্যের নবতম বিস্ময় (নবতম কেননা মাত্র বছর তিনেক হলো এর আবিষ্কার।) টেরিডোফাইটা বিভাগের Pteris গণের অন্তর্গত VITATA প্রভাবিত।

আমেরিকার বিজ্ঞানী মার্ক এলেস এবং তার সহবিজ্ঞানীদের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে জানা গেছে যে এই গাছটির জল থেকে আর্সেনিক শোষণের ক্ষমতা বিস্ময়কর। প্রতি কিলোগ্রাম জলের থেকে একুশ গ্রামের একটু বেশী আর্সেনিক ধরে রাখতে পারে এই গাছ। এভাবেই জল পরিশুদ্ধির কাজও এই গাছ সহজে চালিয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতির নাম হচ্ছে Phytofiltration বা উদ্ভিদ পরিস্রাবণ। মাত্র২৪ ঘণ্টার মধ্যে, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ১ লিটার জলে ২০০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিকের ঘনত্ব প্রায় ১০০ ভাগ কমিয়ে আনা যায় যা USEPA (United States environmental Protection Agency) র নির্ধারিত জলে আর্সেনিকের নতুন সহজসীমা মাত্রার অনেক অনেক নীচে।

যত মুশকিল তত আসান। সম্ভবত এই আপ্ত বাক্যটির সমর্থনেই আর্সেনিকের বিষ পানকারী নীলকণ্ঠ গাছের খোঁজ পেয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা। 'Pteris Vitata'র জল পরিশোধনের যে ক্ষমতা তা ভবিষ্যতের মানুষের জন্য আনন্দবারতা বৈকি। কেননা খুব কম খরচে জল আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা বজায় রাখতে এই গাছটির ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে ফলপ্রসূ হবে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাছাড়া এই গাছ বারবার বেশ কয়েক দফা জলশোষণে ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতির মতো এই Phytofiltration নয়। কেননা এই পদ্ধতিতে কোন রাসায়নিক অধঃক্ষেপ পড়ে না। ফলে আর্সেনিকজনিত কোন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন না হওয়ার ফলে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মতো সমস্যাও সৃষ্টি হয় না। বরং ব্যবহৃত ফার্ন গাছগুলির নিংড়ে নেওয়া রস থেকে আর্সেনিক নিষ্কাশন করে মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজার মতন পরে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন শুধু প্রয়োজন এই বিশেষ গাছটিকে চিহ্নিত করা এবং সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করা। যাতে তার চাষ এবং বাণিজ্যিকভাবে পদ্ধতিটির বিকাশ ঘটানো যায়। ভালো কথা, এই নীলকণ্ঠ গাছের খোঁজে বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মতো উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুই এরা পছন্দ করে বেশি।

—জগন্ময় মজুমদার, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়

আর্সেনিক বিষক্রিয়া এবং কৃষির মাধ্যমে তার প্রতিকার

ভূগর্ভস্থ জলে সর্বাধিক গ্রহযোগ্যতা সীমার (০.০৫ মিলি গ্রা/ লিটার) উপরে আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রথম পাওয়া যায় ১৯৭৮ সালে। তার পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতায় সর্বপ্রথম মানুষের দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নির্ধারিত হয়। এই বিষক্রিয়ায় মানুষের চামড়া কালো হয়ে যায়, এমনকি বৃহদাকার যকৃৎ কিংবা শ্বাসকষ্ট অথবা কর্কট রোগও হতে পারে। ভারত ছাড়া এর পূর্বে বাংলাদেশ, আর্জেন্টিনা, চীন, কানাডা, আমেরিকা, মেক্সিকো, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ও আর্সেনিক দূষণ লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৮টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলার ৮১টি ব্লকের ভূগর্ভস্থ জল বর্তমানে আর্সেনিক দ্বারা দূষিত। এই ৯টি জেলা হল কোলকাতা সহ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া হুগলি, উত্তর ও দঃ ২৪ পরগনা, এই জেলাগুলির প্রায় ৩৮,৮৩৫ বর্গ কিমি এলাকার ৬০-৭০ লক্ষ মানুষ মারাত্মক দূষণ দ্বারা প্রভাবিত ও জর্জরিত। এরমধ্যে আবার ভাগীরথীর পূর্বদিকের ৫টি জেলা (মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) মারাত্মকভাবে আক্রান্ত, শুধুমাত্র পানীয় জল দূষণ এর মাধ্যমেই যে মনুষ্যসমাজ আক্রান্ত হয় তাই-ই নয়, যেহেতু ভূগর্ভস্থ জলের সিংহভাগ ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও আর্সেনিক দূষণের আলাদা ভূমিকা আছে। আর্সেনিকযুক্ত ভূগর্ভস্থ জল সেচকার্যে ব্যবহারের ফলে ধান গম ও শাকসব্জীর মধ্যেও ব্যাপকহারে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। সাধারণভাবে অন্যান্য ফসলের তুলনায় বোরো ধান অপেক্ষাকৃত বেশী আর্সেনিক গ্রহণ করে থাকে যেহেতু বোরো ধান এমন সময় চাষ হয় (জানুয়ারি-এপ্রিল) যখন বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে, তাছাড়া বোরো ধানের জলের প্রয়োজনীয়তাও বেশী তাই বোরো ধান চাষ সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভস্থ জলের দ্বারা সেচের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় পানীয় জল ও খাদ্য শষ্যের সাথে আর্সেনিক প্রাণী শরীরে অনবরত প্রবেশ করে থাকে। এমনকি গবাদি পশু অর্থাৎ গরু, ছাগল, মোষ এবং গৃহপালিত প্রাণী হাঁস, মুরগীর মাংস ও ডিমের মাধ্যমে তা পরোক্ষভাবে মানবশরীরে প্রবেশ করছে। (সূত্র : ICAR,২০০১)।

আর্সেনিকের উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণ

আর্সেনিক যুক্ত খনিজের উৎস হিসাবে ভূতাত্ত্বিকেরা ছোটনাগপুর মালভূমি, ও গাড়ো রাজমহল পাহাড়কে চিহ্নিত করেছেন। এই সমস্ত অঞ্চলের নুড়ি, পাথরগুলি অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদী দ্বারা বাহিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাজমহল পাহাড়ের চ্যুতির অংশবিশেষ।

সারণী : ১ পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে কয়েকটি ফসলের বিভিন্ন অংশে আর্সেনিকের মাত্রা (মিগ্রা/কিগ্রা)

স্থান	ফসল	আর্সেনিক মাত্রা			
		মূল	কাণ্ড	পাতা	দানা বা ফল
গোটরা ও খেটুগাছি	ওল		৮.৩০	৪.৬০	৪.২৩
ব্লক : চাকদহ	মুগ	৬.০০	৫.৭০	৫.২৪	৪.১০
জেলা : নদীয়া	বরবটি	৬.১০	৫.৩৮	৫.০০	২.২৬
	পাট	১১.০০	৯.৩০	৩.৬৯	৪.২০
	বাদাম	৩.১০	২.৪৩	২.১২	৪.১০
	সর্ষে	৭.২৩	৬.৯৬	৭.০০	২.৯০
	গম	১৪.০০	৬.৯০	৫.৮০	৩.২৬
	বোরো ধান	৮.৩০	৭.৩২	৮.৪২	১০.১

সূত্র : ICAR (2001), Ghosh et al (2004), Sanyal (2005)

তাই এই দূষণ প্রতিরোধের কথা বলতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল 'শষ্য বৈচিত্র্যকরণ'। তাই শষ্য পর্যায়ে যেখানে বোরো ধান চাষ হত, সেইসব স্থানে জল সাশ্রয়কারী ফসল চাষ করা অত্যাবশকীয়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ফসল চাষই নয়, এইসমস্ত স্থানের জন্য উপযুক্ত শষ্যক্রম নির্ধারিত করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে আর্সেনিক কবলিত এলাকার জন্য কিছু জলসাশ্রয়কারী ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শষ্যপর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হল (সারণী : ২)।

সারণী : ২ জলসাশ্রয়ী এবং কৃষকদের কাছে লাভজনক বেশ কিছু শষ্যপর্যায়

	রবি খন্দ	প্রাক খরিফ খন্দ	খরিফ খন্দ
১.	আলু (নভেঃ - ফেব্রুঃ)	পাট (এপ্রিল-জুলাই)	ফুলকপি/কুমড়ো (সেপ্টেঃ - নভেঃ)
২.	সর্ষে (নভেঃ - মার্চ)	ওল (মার্চ-সেপ্টেম্বর)	———
৩.	সর্ষে (নভেঃ - মার্চ)	সবুজ সার (মে-জুন)	আমন ধান (জুলাই- অক্টোবর)
৪.	মসুর (নভেঃ - ফেব্রুঃ)	তিল (মার্চ-মে/জুন)	কুমড়ো (জুলাই - সেপ্টেম্বর)
৫.	গম (নভেঃ - মার্চ)	মুগ (মার্চ/এপ্রিল-মে/জুন)	আমন ধান (জুলাই - অক্টোঃ)

সূত্র : Ghosh et al, (2005)

মাটির জৈব উপাদানগুলির কিছুটা হলেও আর্সেনিক ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এখন নিবিড় চাষ পদ্ধতির জন্য মাটির জৈব উপাদানের পরিমাণ কমছে। তাই গোবর সার, কম্পোষ্টসার, সবুজ সার এবং বিভিন্ন জৈব সার প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেছে। নীচু জমিতে যেখানে বোরোধান চাষ প্রায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই করতে হয় সেখানে জিঙ্কের ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেচ

এরপর ৭ এর পাতায়

পাখি : ময়ূর

১ পাতার পর

বলে। নয়নমনোহর পেখমে চোখের মত চিত্র আঁকা থাকে। এই কারণে ময়ূরকে সহস্রলোচন বলেও ডাকা হয়। এছাড়া মাথায় লিখা থাকায় ময়ূর লিখী নামেও পরিচিত। ময়ূরের মূল পুচ্ছ আকারে ছোট এং এ রং গাঢ় পিঙ্গল। ময়ূরের ডাককে কেকা ধ্বনি বলে। ময়ূর নদীর গুল্মায় ও প্রদেশ, পর্বতগুহা বা অরণ্যের প্রান্তদেশে শস্যক্ষেত্রে বাস করে। একটি ময়ূরের দলে একটি পুরুষ ও একাধিক স্ত্রী ময়ূর বাস করে। ময়ূরের স্বর তীক্ষ্ণ এবং কর্কশ। এদের খাদ্য তালিকায় শস্য, গুল্ম, উদ্ভিজ্জ এবং ব্যাঙ, সঙ্গে প্রভৃতি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী আছে। ময়ূরের পালক বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস। ময়ূরের পালক কুটির শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পালকের ডাঁটি দিয়ে মাছ ধরার ফাতনা তৈরি হয়। ময়ূর ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড়, সাপ খেয়ে মানুষের উপকার করে। রঙিন পেখম বা পাখা, কেবল পুরুষ ময়ূরদেরই থাকে। প্রজনন সময় এগিয়ে এলে এরা এই দৃষ্টিশোভন পেখম ছড়িয়ে ময়ূরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরুষ ময়ূর একসঙ্গে পাঁচটি পর্যন্ত ময়ূরী সঙ্গিনী নিয়ে বাস করে। প্রতিটি ময়ূরী ৪—৮টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে ১৮ দিন থেকে একমাস সময় লাগে।

গলা ব্যথা ও তার চিকিৎসা

গলা আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অঙ্গ। একদিকে শ্বাস প্রশ্বাস, কথা বলা থেকে আরম্ভ করে অন্যদিকে খাদ্য গ্রহণের মতো জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের গলার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সাধারণভাবে আমরা গলাকে বাইরে থেকে একটা অঙ্গ ভাবলেও আসলে এরমধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। গলবিল হল মুখগহ্বর এবং গ্রাসনালী বা খাদ্যনালীর মধ্যবর্তী অংশ। এই অংশের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে গ্রাস নালী বা খাদ্যনালীতে ঢোকে। গলবিলটিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় — (১) নাকের পেছনে নাসাগহ্বরের সঙ্গে সংযোগকারী অংশ বা নাসা গলবিল। (২) মুখগহ্বরের সঙ্গে সংযোগকারী মুখ গলবিল এবং (৩) স্বরনালীর সঙ্গে সংযোগকারী স্বর গলবিল।

গলার মধ্যে আমাদের শ্বসনতন্ত্রের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ থাকে। ওপরেরটি হল ল্যারিংক্স বা স্বরযন্ত্র। এখানে তারের মতো দুটো ভোকাল কর্ড থাকে। এরা স্বর সৃষ্টিতে সাহায্য করে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলেও সাহায্য করে। ল্যারিংক্স এর দৈর্ঘ্য একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের ক্ষেত্রে মাত্র চার সেন্টিমিটারের মতো। ল্যারিংক্স-এর শেষভাগ গলার মধ্য দিয়ে বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যে নালী গঠন করে, তা হল শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া। নাসা গলবিল ও মুখ গলবিল দিয়ে নাক বা মুখ দিয়ে নেওয়া প্রশ্বাস স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর মাধ্যমে ব্রডকাস নামের দুদিকে দুটো অঙ্গের মাধ্যমে বুকের মধ্যে দুদিকের ফুসফুসের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তেমনি ফুসফুস হতে আগত নিশ্বাস ঠিক এর উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়ে নাক বা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গলার বাইরের দিকে ঠিক সামনে ও মাঝখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকে, এই গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন শরীরের নানারকম গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। গলার বাইরের দিকে বিভিন্ন লালাগ্রন্থি ও লসিকাগ্রন্থিও থাকে। গলা ও গলার আশেপাশের এবং অন্যান্য বিভিন্ন অসুখে বা কখনো অসুখ ছাড়াই লসিকাগ্রন্থিগুলো ফুলে বড় হয়।

প্রতিনিয়ত আমরা যেসব গলা ব্যাথার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত, তা ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণে মুখ গলবিলের প্রদাহের জন্য হয়। ঠাণ্ডা পানীয়, জল, ঠাণ্ডা খাবার, আইসক্রীম, হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া, পরিবেশের গরম ঠাণ্ডার হঠাৎ করে তারতম্য এর অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে অধিকাংশ সময়েই দায়ী থাকে। গলা ব্যাথার সঙ্গে সঙ্গে খেতে গেলে ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়। মুখ হাঁ করলে দেখা যায় যে মুখ গলবিল লাল হয়ে গেছে, জ্বর, মাথা ব্যাথা এসব হতে থাকে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক মাউথওয়াশ দিয়ে গার্গল, প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বা ব্যাথার ওষুধ এ ধরনের গলা ব্যাথার চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী। মুখ গলবিলের প্রদাহের পাশাপাশি কারো কারো ক্ষেত্রে আবার দুপাশের টনসিল দুটো বা আলজিভটা ফুলে গিয়ে রোগীর কষ্ট বাড়িয়ে তোলে। অনেক সময়ে নাকে বা নাকের পেছনে অবস্থিত নাসা গলবিলে বিভিন্ন কারণে স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যেমন, নাকের পলিপ, অ্যালার্জিজনিত পলিপ, অ্যালার্জিজনিত সর্দির ধাত, নাকের হাড় বা টার্বিনেট বড় হয়ে যাওয়া, নাকের টিউমার, নাকের মাঝখানের হাড় বাঁকা থাকা, নাসা-গলবিলে অবস্থিত অ্যাডেনয়েড গ্রন্থিটি বড় হয়ে যাওয়া বা নাসা গলবিলে টিউমার হওয়া, এসব কারণের ফলে নাকের পরিবর্তে রোগী মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হন।

ঘন ঘন ধূমপান, খৈনী, তামাক, গুটখা, গুড়াখু, জর্দা, সুপারি প্রভৃতি নেশা অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিরিক্ত ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার মুখ গলবিলের প্রদাহ ঘটিয়ে বারবার গলা ব্যাথা করতে পারে। বায়ুমণ্ডলের দূষণ, ধোঁয়া-ধুলো যুক্ত পরিবেশ গলা ব্যাথার কারণ হতে পারে। অ্যাসিডিটি বা অম্বল গ্যাসট্রিকের ধাত যাদের তাদের কারো কারো ঘন ঘন গলা ব্যাথা হতে পারে। অতিরিক্ত কথা বলা বা জোরে চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস থেকে মুখ গলবিলের প্রদাহজনিত কারণে বারবার গলা ব্যাথা হয়ে থাকে।

মুখ গলবিলের সংক্রমণের ছাড়াও টনসিলের আলাদা করে সংক্রমণ হয়ে বারবার গলা ব্যাথা হতে পারে। টনসিলের সাধারণ ব্যাকটিরিয়াঘটিত প্রদাহ ছাড়াও ডিপথেরিয়া রোগে টনসিলের সাদা পর্দা দেখা দিয়ে গলা ব্যাথা হতে পারে। অনেক সময় ছত্রাকজাতীয় সংক্রমণেও টনসিলের সাদা পর্দা পড়ে গলা ব্যাথা হয়। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। যদিও আজকাল শৈশবে ডিটিপি প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য ডিপথেরিয়া প্রকোপ অনেক কমে গেছে।

টনসিলের আশেপাশের জায়গা ছাড়াও গলার অন্যান্য জায়গা, যেমন— মুখ গলবিলের পেছনের দেওয়ালে ধারের দিককার অংশে সংক্রমণ হয়ে পুঁজ জমে যেতে পারে। জিভের তলায় বা তার আশেপাশের গলার অংশেও একরকম পুঁজ জমে যেতে পারে। জিভের তলায় বা তার আশেপাশের গলার অংশেও একরকম পুঁজ জমে যেতে পারে। এসব অসুখের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গলাব্যাথা হয়। দাঁতের বা মাড়ির বিভিন্ন ইনফেকশন বা সংক্রমণ এসব পুঁজ জমার অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করে। এসব ক্ষেত্রে জরুরীভিত্তিক অপারেশন করে পুঁজ বের করতে হবে।

গলার মধ্যে আমাদের শ্বাসনালী বা ল্যারিংক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখানকার যে কোনও অসুখ যেমন, জীবাণুঘটিত ইনফেকশন বা সংক্রমণ, ক্যান্সার প্রভৃতি গলা ব্যাথার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি গলার স্বর বসে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হলে ঔষধে কাজ না হলে প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের নীচের শ্বাসনালী ফুটো করেও মানুষকে বাঁচানো যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের স্বরযন্ত্রের ভোকাল কর্ডের একটা নিজস্ব কম্পাঙ্ক থাকে। অনেক সময়ে আমরা গাইতে গিয়ে বা কথা বলতে গিয়ে বা অতিরিক্ত স্বরযন্ত্রকে ব্যবহার করে এই নিজস্ব কম্পাঙ্ককে লঙ্ঘন করে ভোকাল বার্ডের মাধ্যমে নানারকম সমস্যা নডিউল, পলিপ, রেইনকে'স ইডিমা প্রভৃতি অসুখ ডেকে আনি।

এছাড়া স্বরযন্ত্রে অনেক ছোটোখাটো টিউমার হতে পারে। এসবে গলার স্বর বসে যাওয়ার পাশাপাশি গলা ব্যাথাও হতে পারে। শ্বাসনালীর পেছনে থাকে খাদ্যনালী। খাদ্যনালীর টিউমার, ক্যান্সার, জীবাণুঘটিত সংক্রমণ, অ্যাসিড খেয়ে খাদ্যনালীর ক্ষতি হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অসুখে গলা ব্যাথা হয়ে থাকে।

গলার দুপাশে অবস্থিত দুটো লালাগ্রন্থির, কোন একটির নালীতে অনেক সময় পাথর হয়ে বা জীবাণুর আক্রমণেও গলা ব্যাথা হয়। গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে যায়। অপারেশন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। থাইরয়েডের অসুখেও গলা ব্যাথা হয়, বারবার ঠাণ্ডা লাগতে পারে। গলার সামনে ও আশেপাশে অবস্থিত লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলো নানারকম জীবাণুর আক্রমণে বিভিন্ন অসুখে বা ক্যান্সার হয় ফুলে যেতে পারে, এসব কারণেও গলা ব্যাথা হয়ে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অন্যের গলা নকল করে গাইতে গিয়ে, জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে বা অতিরিক্ত কথা বলে গলার ভোকাল কর্ডের ক্ষতি নানারকম অসুখ হয়। তাই প্রত্যেক শিল্পীকে গাইতে হবে, আবৃত্তিকারকে আবৃত্তি করতে হবে নিজস্ব ছন্দে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা প্রাণায়ামের অভ্যাসও গলাকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। *—সৌম্যজিৎ দত্ত, এন আর এস হসপিটাল, কলকাতা, ৯৪৩৩১২১৪৯২।*

কৃতজ্ঞতা : স্বাস্থ্যদীপিকা, এপ্রিল-২০০৬

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

কামরার টালির চালের এক পুরনো ঘর। প্রথম ডান দিকের ঘরে ভেতরে শেতলা মূর্তি, মনসা মূর্তি আর দেওয়ালে নানান দেব-দেবীর ক্যালেন্ডারে ভর্তি। ছোট সংকীর্ণ ঘর মূর্তিগুলির সামনে মাটির ঘটে শুকনো নারকেল। ঘরের মেঝেতে ছোট মাদুর পাতা। তাতে এক মধ্য বয়সী লোক পেট উন্মুক্ত করে শুয়ে আছে। তার হাঁটুর তলার অংশ দরজার বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। মাথার কাছে ভীম বাগদী। ডান দিকের ঘরের কোণে এক বয়স্ক মানুষ তাকে সাহায্যের জন্য বসে আছেন। তাকে দূর থেকে দরজা দিয়ে দেখা যায় না। আমরা পৌছেছিলাম সকাল ৮টার আগে। টিকিট চাইতে ঐ বয়স্ক ভদ্রলোক একটা কাগজের টুকরো ধরিয়ে দিলেন। যাতে বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই পঁচিশ লেখা। ছোট সরু বারান্দায় মেয়েরা বসে। উঠানের দুপাশে বসার জায়গা গুলি ভর্তি। আজ শনিবার বেলা ১১টার পর আবার বান কাটানো হবে। বান কাটানো হবে পাশের ঘরে। পাশের ঘরের দরজা শেকল দেওয়া। পাল্লার তলার অংশটি ভাঙা। এতক্ষণে বয়স্ক লোকটি উঠে পড়েছে। হাতে পান পাতা। চালার বাইরে এসে পাতাটা খুলে দেখছে পাতার ওপর কালো চটচটে আঠালো একটি ডেলা। হাত দিয়ে ধরতে গেলে বললো না ধরবেন না। অন্যে হাত দেওয়া মানা। চালার বাইরে দু ঘরের মাঝ বরাবর এক ভাঙা টিনের পাত্রে পান পাতাটা ফেলে দিল। দেখা গেলো আরও অনেক পান পাতা ঐ পাত্রে।

চোদ্দ নম্বর রেডি ছিল। হাতে দুটি পান পাতা, এক পাতা ধূপ। এক কম বয়সী আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলে। টাইট জিনস, বেল্ট পরে থাকা ছেলেটি বসে পড়লো মাদুরে। ভীমের সামনা সামনি। অসুবিধা নিয়ে কিছু কথা হলো। রুগীই পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা মাটির ঘটের সামনে রাখলো। ওখানে আরও কিছু নোট মাটিতে পড়ে আছে। ছেলেটি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। জামাটা তুলে পেটটা অনাবৃত করলো। ভীম পেটে হাত দিয়ে 'নাই' টা খুঁজে পেলো না। ছেলেটিকে কিছু বললো। ছেলেটি শুয়ে শুয়ে বেল্টটা খুললো, প্যানটা আলগা করলো। পাশেই সরষের তেলের শিশি ছিল। খানিকটা তেল পেটে ঢাললো। পেটের খানিক অংশ তেলটা মোটা করে মাখিয়ে রাখলো। পেটের উপর একটি পান পাতা বিছিয়ে রাখলো। হাতে ধরা আর একটি পান পেটে ঠেকিয়ে মুখ নিচু করে ভীম মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে থাকলো। এই সময় সন্তর্পনে ঐ আঠালো জিনিসটি পেটে নাভির উপর রেখে দিলো। কিছুক্ষণ ফুঁ চলার পর মন্ত্র শুরু হলো। এবার ১টি পান পাতা সরিয়ে পেটের ওপর রাখা অন্য পাতার ওপর কিছু শেকড়ের টুকরো বিছানো হলো। অন্য পান পাতাটি দিয়ে শেকড়গুলো চাপা দিয়ে তার উপর একটি শিং এর টুকরো রেখে আবার মন্ত্র চললো কিছুক্ষণ। এবার পানের পাতা, শিং, শেকড়ের টুকরো সব সরিয়ে নেওয়া হলো।

এবার কাঠের গুড়ো দিয়ে তৈরি ডিমের আকৃতির একটি মণ্ডের টুকরো নিয়ে পাশে জ্বলা কেরোসিনের কুপির গায়ে ঘষে কেরোসিনে ভেজানো হলো। কাঠের গুড়োর মণ্ডটি কুপিতে জ্বালিয়ে ডান হাত দিয়ে পেটের ওপর রাখা হলো। বা হাত দিয়ে আমাজা একটা বড় মুখের ঘটি উল্টে পেটের উপর জ্বালা কাঠের মণ্ডটিকে চাপা দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটির অক্সিজেন শেষ হয়ে আগুন নিভে গেল। বাইরের বায়ুর চাপ থেকে ভেতরের বায়ুর চাপ কমে ঘটিটা পেটকে টেনে ধরেছে। ভীম বাঁ হাত দিয়ে ঘটিটাকে ধরে ডান হাতের আঙুল দিয়ে পেটে চাপ দিতে থাকে যাতে তৈলাক্ত পেটের উপর চেপে থাকা ঘটিটার মধ্যে বাতাস ঢোকানো যায়। হাওয়া ঢুকতেই ভপ্ করে শব্দ হয়। ঘটি আলগা হয়ে যায়। ঘটি তুলে নিয়ে এই প্রক্রিয়া চলে ৩/৪ বার।

এরপর নাভি থেকে আঙুল দিয়ে বের করা হলো সেই কালচে আঠালো ডেলটা। তা পানের পাতার উপর রেখে দিয়ে দেখানো হল পেট থেকে ওষুধ তোলা হয়েছে। কাউকে ২/৩ দিনও আসতে বলা হয়। কাউকে মাদুলি ত্রিশ টাকা নিয়ে দেওয়া হয়।

বাণ কাটানোর কাজ হয় বেলায়, এতে ধূনোর দাম সমেত ত্রিশ টাকা নেওয়া হয়। বান মারা ব্যক্তিকে পাশের ঘরে শুইয়ে নতুন গামছা দিয়ে ঢাকা হয়। বাঁ হাত দিয়ে কেরোসিন কুপি ধরে ডান হাত দিয়ে মিহি গুড়ানো ধুনো ছোঁড়া হয় শুয়ে থাকার ব্যক্তির সমান্তরালে। কুপির আগুনে ধুনো জ্বলে আগুনের গোলা তৈরী হয়। বারবার চারিদিক থেকে এভাবে ধূনো গুড়ো ছোড়া হয়। ব্যক্তিটির খানিকটা ওপরে আগুনের গোলা তৈরী হয় এবং আগুনের ধর্মের জন্য আগুন ওপর দিকে ওঠে। আগুন নিচে না যাওয়ার জন্য ব্যক্তিটিকে আগুন স্পর্শ করে না। এই আশ্চর্য জিনিস দেখে এং সরল মানুষগুলির বিশ্লেষণ ক্ষমতা না থাকায় অবাক হয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। নির্দিষ্ট অসুখ নিয়ে আরও কিছুদিন নিশ্চিন্ত ভাবে সে ঘরে বসে থাকে। যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তখন তার পাথর বা ঘা, মনের অসুখ বা শরীরের কোনো টিউমার এমন আকার নেয় যা আর ডাক্তারী বিদ্যায় সুস্থ ভাবে ফিরিয়ে আনার আর রাস্তা থাকে না। ডাক্তারী বিদ্যায় অসুখের নিরাময় হতে পারে, তা প্রমাণের সুযোগ থাকে না।

আমাদের এই ত্রিবেণী আধা শহর থেকে রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকা খরচ। এর পর ওষুধের খরচ। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার খরচ। যা নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে অসম্ভব। তাই তারা পাশের পাড়ায় ওঝার কাছে যায় ৫, ১০ টাকা খরচ করে উপশম পেতে। কিছু রোগ তো শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতায় নিজে নিজেই সারে। এই বিষয়গুলিতে এই প্রান্তিক মানুষগুলিকে শিক্ষিত করা হয় না। যদি এরা চেয়ে বসে স্বাস্থ্যের অধিকার।

—মহাদেব মল্লিক, ত্রিবেণী যুক্তবাদী সংস্থা

খাদ্যে ভেজাল রোধে আইন সংশোধন

খাদ্যে ভেজাল রোধ আইন (PFA Act) এর কিছু অংশ ভারত সরকার সংশোধন করে ২৫ নভেম্বর ২০০৫ '(গেজেট অব ইন্ডিয়া' তে) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সংশোধনীগুলি কার্যকরী করতে বলা হয়েছে— ১। ভেজাল পরীক্ষকদের (Public analysist) শিক্ষাগত মানের ক্ষেত্রে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন, জৈব রসায়ন, খাদ্য প্রযুক্তি (Food Technologhy), মাইক্রোবায়োলজি, খাদ্য ও ড্রাগ-এর মতো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডেয়ারী রসায়নের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেতে হবে। এর ফলে খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মান পরীক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট।

(www.mohfw.nic.in/pta.htm)

আর্সেনিক

৪ পাতার পর

(Intermittent Irrigation) ব্যবস্থার মাধ্যমে সুফল পাওয়া যেতে পারে। গঙ্গা, ভাগীরথী দ্বারা বাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এই বিশাল অববাহিকার সৃষ্টি করেছে। সেচের কাজে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপক উত্তোলনের ফলে জলস্তর ক্রমাগত নামতে থাকে। বাতাসের অক্সিজেন সেই সাথে প্রবেশ করে আর্সেনিকের খনিজ আর্সেনিক পাইরাইটের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিককে মুক্ত করে। এটি 'পাইরাইট অক্সিডেশন থিয়োরী' নামে পরিচিত। এছাড়া বিজারিত পরিবেশে ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক যৌগ বিজারণ প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সাম্প্রতিক কালে আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের এনভায়রণমেন্টাল হেলথ পারসপেক্টিভ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা হিমালয় পর্বতকে ও আর্সেনিকের উৎস হিসাবে ভাবে দায়ী করছেন।

উপস্থিত আর্সেনিকের বিভিন্ন জৈব ও অজৈব দশা :

'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার' নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্সেনিকের নিরাপদমাত্রা ০.০১ মিগ্রা/লিটার জলে। উপস্থিত আর্সেনিক বিভিন্ন জৈব ও অজৈব রূপে থাকতে পারে। বিভিন্ন অজৈব দশাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাই মিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড বা ক্যাকোডিলিক অ্যাসিড। বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ ফলের মাধ্যমে দেখা গেছে অজৈব আর্সেনিকের ৩ (তিন) যোজ্যতা বিশিষ্ট যৌগগুলি অধিক ক্ষতিকারক ৫ (পাঁচ) যোজ্যতা বিশিষ্ট যৌগগুলির থেকে। উদ্ভিদ কর্তৃক এদের গ্রহণযোগ্যতা আর্সেনিক-এর রাসায়নিক অবস্থা ও ভৌত রাসায়নিক ধর্মের উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে মাটিতে আর্সেনিকের বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থার উপস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাটির Eh (জারণ-বিজারণ অবস্থা), P^H, আনুবীক্ষণিক জীবের (জীবাণু) কার্যকারিতার দ্বারা। আর্সেনিকের বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থাগুলি তাদের বিষক্রিয়ার ক্রম অনুযায়ী বর্ণিত হল —

আর্সাইন গ্যাস (আর্সেনিক হাইড্রাইড) : আর্সেনিকের যোজ্যতা- ৩) > জৈব আর্সাইন-এর বিভিন্ন যৌগ > আর্সেনাইট (+৩) এবং অক্সাইড (+৩) > আর্সেনেট (+৫) > আর্সেনিয়াম ধাতু (+১) > আর্সেনিক মৌল (০)।

আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধের উপায়

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের (Ghosh et al, 2004; Sanyal et al 2005) লব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে বিভিন্ন আর্সেনিক কবলিত স্থানে উদ্ভিদদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণ আর্সেনিক উপস্থিত (সারণী নং ১)। ভূগর্ভস্থ জল দিয়ে শুধু ধানই নয় গম, আলু, ভুট্টা, বিভিন্ন শাকসব্জী, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি চাষ হয়ে থাকে। তাই স্বভাবতই এই ফসলগুলির ও আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ভূপ্রকৃতিস্থ জলাশয়ে (Water Harvesting) সঞ্চিত রেখে শীতকালে যখন বৃষ্টি হয় না তখন সেচের কার্যে ব্যবহার করতে হবে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে বৃষ্টির জল-এর মাধ্যমে পুনঃস্থাপন করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আর্সেনিকের মাত্রা কমানো যেতে পারে।

সর্বোপরি 'জৈব উপায়ে আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ' হল বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার। কিছু আগাছা রয়েছে যারা সাধারণ ফসলের তুলনায় বেশিমাত্রায় আর্সেনিক নিজের দেহে গ্রহণ করে ও বেঁচে থাকে। তাই এগুলি পতিত জমিতে বা ফসলি জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই গাছগুলি লাগিয়ে জমিকে আর্সেনিক মুক্ত রাখা যায়। কিছু জলজ উদ্ভিদ যেমন, নীলাভ সবুজ শৈবাল, পাতা ঝাঁঝি, ঝাঁঝি শ্যাওলা কচুরীপানা এমনকি স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের ফার্ন মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক গ্রহণ করতে পারে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুদূষণ এবং আরও বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যার সাথে সাথে আর্সেনিক দূষণও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যা দূরীকরণের জন্য সর্বস্তরের মানুষকে হতে হবে সচেতন। শুধুমাত্র গবেষণাই নয়, গবেষণালব্ধ ফলগুলির যথাযথ ব্যবহারই হবে এই সমস্যা মোচনের উপায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে কল্যাণীর ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টারে ১৬-১৮ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বেঙ্গল বেসিন-এর উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও সাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসই আমাদেরকে এই সম্যার সমাধানের পথ দেখাবে।

—মিঠুন সাহা, প্রযত্নে শিশির কুমার সাহা, হায়দারপুর (অগ্রনী ক্লাব), বাঙ্গালটুলি লেন, পো: ও জে : - মালদা। ফোন : ৯৪৩৪৪৫৬৭৯৯

পানীয় জলে আর্সেনিক পরীক্ষা /সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষণের শিকার। দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ কতটা, কোথায় কি পরিমাণ, সমীক্ষার কাজ গত ১৯৯৩ সাল থেকেই বিজ্ঞানকর্মীরা চালিয়ে আসছেন। পানীয় জলে আর্সেনিক-এর মাত্রা আপনি কি পরীক্ষা করাতে চান? কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, কলকাতার আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে জল পরীক্ষার কাজে আপনাকে আমরা সহযোগিতা করতে পারি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (কলকাতা) দপ্তরে জল নিয়ে যাওয়া, রিপোর্ট সংগ্রহ বাবদ প্রতিটি নমুনা পিছু মাত্র ৫ টাকা সাহায্য করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকর্মীদের কাছ থেকে জলের পাত্র (অ্যাসিড সহ) সংগ্রহ করতে হবে। সাক্ষাতে যোগাযোগ : স্টুডিও ইউনিক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, লক্ষী সিনেমা, কাঁচরাপাড়া। ফোন : ২৫৮৫-০৬৩৯, শুভ্র প্রকাশ পাত্র— ৯৪৩৩৩৬২৪৭৮, সুরজিৎ পাল— ০৩৩২৮৭৬০৭২০, বিবর্তন ভট্টাচার্য— ৯৪৩৪১১০৯৬৯/৯৩৩২২৮৩৩৫৬, পান্নালাল মানি — ৯৮৩০৪৮২০৯২, জয়দেব দে — ৯৪৩৩০৫৬০৭৮, মহাদেব মল্লিক — ০৩৩২৬৮৪৫৫৫৪, অভিজিৎ চাকলাদার — ০৩৪৭৩২৩৩২৫৬, বিজয় সরকার — ০৩৩২৫৮০৮৮১৬

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।
যোগাযোগ
পান্নালাল মানি, ধরমপুর হোস্টেল, মাঝিপাড়া, উ: ২৪ পরগনা

পরিবেশ দিবসের ভাবনা

২ পাতার পর

রাজ্যে বেশ কয়েকটি কারখানার দূষণ নিয়ে অভিযোগ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বিশেষত ট্যাংরা ও হাওড়ার মৌড়িগ্রামে কষাইখানার দূষণের বিরুদ্ধে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে শো-কজ করেছেন। বিষয়টি খুবই লজ্জার।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানকর্মীরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে যে, পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ বেড়েই চলেছে। অথচ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবিষয়ে বরাবরই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। 'জলাশয় রক্ষা করা'— পরিবেশ দপ্তর তথা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের একটি অন্যতম বড় কাজ, অথচ বহু সংস্থার অভিযোগপত্র শুধুমাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি।

জলদূষণ যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে বেড়ে চলেছে তা আমাদের সকলেরই জানা। আর্সেনিক দূষণ, ফ্লোরাইড দূষণ সহ জলবাহিত রোগ। The Water (Prevention & Control of Pollution), Act, 1974. আইন অনুযায়ী জলের গুণমান নির্ণয় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অথচ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ আদৌ হয় না।

সাধারণভাবে এই দাবীটি হওয়া উচিত যে প্রতিটি শিল্প-কলকারখানায় দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হবে, পাশাপাশি দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছাড়া শিল্পকারখানার ছাড়পত্র যাতে না পায়। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই দিয়ে জলাশয় ভরাট সম্পূর্ণ বেআইনী। পরিবেশ দপ্তরে এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয় না, শুধুমাত্র চিঠিপত্র আদান-প্রদানই চলে।

পরিবেশ দূষণ চিত্র : ৪

প্রাকৃতিক জ্বালানির ব্যবহারে মানুষের মৃত্যু বাড়ছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ রান্নার জ্বালানি হিসেবে ঘুঁটে, কাঠ, শুকনো পাতা, কাঠকয়লা ব্যবহার করেন। তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৪৫৬ লক্ষ টন প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহৃত হয়, এর মধ্যে শুধুমাত্র কাঠই হল ২৩৩ লক্ষ টন। প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহারের ফলে দূষণের শিকার হন মূলত মায়েরা ও শিশুরা। বদ্ধ পরিবেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে প্রতিদিন কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, বেনজিন, বেনহোপাইরিন ও ফরম্যাল্ডিহাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে বছরে প্রায় ৬০ হাজার মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সমীক্ষানুযায়ী ভারতে বছরে প্রায় ৬ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত সৌরচুল্লী ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সর্বস্তরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলির (যথা : সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার, জলবিদ্যুৎ-এর ব্যবহার, বায়ুকল, সামুদ্রিক ঢেউ প্রভৃতি) ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন নিগম-এর পক্ষ থেকে জানা গেছে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ১৭টি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় বেশ কয়েকটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবার মুখে।

এছাড়া গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর হাত থেকে রেহাই পেতে আগামী দিনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়াতে হবে।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

পাম তেল কি ওরাং-ওটাং-এর বিলুপ্তি ঘটাবে?

উদ্ভিজ্জ তেল হিসেবে, পাম তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ওরাং-ওটাং-এর বিলুপ্তির পথে চলেছে। পরিবেশবিদ্‌রা এব্যাপারে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেও ওরাং-ওটাং সংরক্ষণের কোনও প্রচেষ্টাই সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের নজরে নেই।

পামতেলের বল্গাহীন ব্যবসার কারণেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে ওরাং-ওটাং ক্রমশ বিলুপ্তির পথে চলেছে।

গড়পড়তা ক্রেতাদের কাছে এটা হয়ত কোনও সমস্যাই নয়, কিন্তু চকলেট, ক্রিপস্, পাউরুটি, কেক, ডিটারজেন্ট, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, লিপস্টিক দ্রব্য সামগ্রীর ক্রেতারা বুঝতেই পারেন না যে কিভাবে এইসব সামগ্রীই পামতেলের বহুল ব্যবহার ঘটাতে গিয়ে ওরাং-ওটাংকেই প্রায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিগত ১৫ বছরে ওরাং-ওটাং-এর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমে গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বৃষ্টি বিধৌত অঞ্চলে এদের দেখা যেত। বর্তমানে সংখ্যাটা ৬০,০০০-এর চেয়েও কম। বছরে এরা ৫০০০ করে কমছে, কারণ ওরাংদের প্রিয় বাসভূমি অর্থাৎ বনভূমি ধ্বংস করে পাম গাছ লাগানো হচ্ছে। বহু খাদ্যদ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণে পাম তেলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও সেটাকে উদ্ভিজ্জ তেল বলা হচ্ছে।

প্রকৃতি সংরক্ষণবাদী ও বেতার ভাষ্যকার ডেভিড অ্যাটেনবারো বোর্ণিও ঘুরে এসে জানাচ্ছেন, ৫বছর আগেও যেখানে চমৎকার বৃষ্টি অঞ্চল ছিল এখন সেখানে বহু সংখ্যায় পামগাছ মাথা তুলছে।

'ফ্রেন্ডস অব আর্থ'-এর এড ম্যাথ্যু বলেছেন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে পামতেল সৃষ্টি হচ্ছে। *সূত্র : দ্য হিন্দু*

সংকলক : শান্তনু বসু, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাঁচল কলেজ, চাঁচল, মালদহ,ফোন : ৯৪৩৪৭১৭৬২৯

চিঠিপত্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা : পান্নালাল মানি, সহ সম্পাদক বিজ্ঞান অন্বেষক, ধরমপুর হোস্টেল, পো: মাঝিপাড়া—৭৪৩১৪৫

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৩৩০৫৬০৭৮।
সম্পাদক মণ্ডলী— পান্নালাল মানি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* *E.mail-* ganabijnan@yahoo.co.in.